দৌলত শাহ'র অদ্ভুত কাহিনী

হুমায়ূন আহমেদ

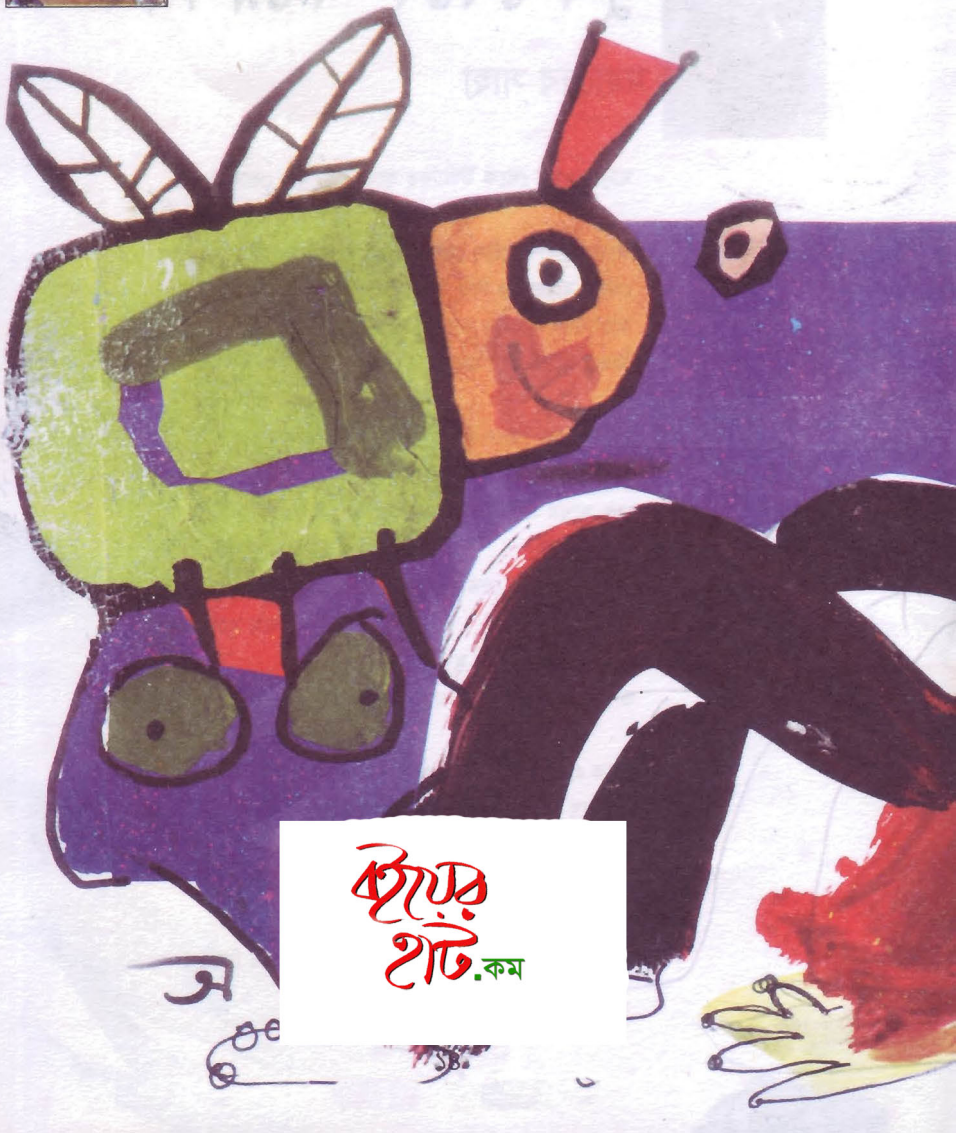

বইয়ের হাট.কম

স্যার, আমার নাম দৌলত শাহ্। এটা আমার আসল নাম না। আসল নাম ধন মিয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। হেড স্যার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, বাবা তোমার নামটা তো ভালো না। অনেক অঞ্চলে নেংটুকে বলে 'ধন'। অর্থ ঠিক রেখে নামটা বদলে দেই?

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

তিনি নামের শেষে শাহ্ টাইটেল দিয়ে দিলেন। ছিলাম ধন মিয়া, হয়ে গেলাম দৌলত শাহ্। হেড স্যার আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর বাড়িতে থেকেই আমি এসএসসি পাস করি। সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করি। আমার বাড়িঘর ছিল না, থাকার জায়গা ছিল না। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট বের হবার পর হেড স্যার বললেন, তুমি দু'টা পরীক্ষাতেই ভালো রেজাল্ট করেছ। তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই এই সামর্থ্য আমার নাই। ঢাকার বাংলা বাজারে থাকেন এক লোককে আমি সামান্য চিনি। তাকে পত্র লিখে দেই। দেখ তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি-না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেন, একটা দু'টা টিউশনি।

আমি বললাম, জি আচ্ছা স্যার।

হেড স্যার বললেন, দেখ কষ্ট করে লেখাপড়াটা শেষ করতে পার কি-না। বিদ্যাসাগর ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া করে বিদ্যার সাগর উপাধি পেয়েছেন। বুঝেছ?

আমি বললাম, জি স্যার।

নগদ একশ সত্তর টাকা, একটা টিনের ট্রাঙ্ক এবং একটা পাটের ব্যাগ নিয়ে ঢাকায় উপস্থিত হলাম।

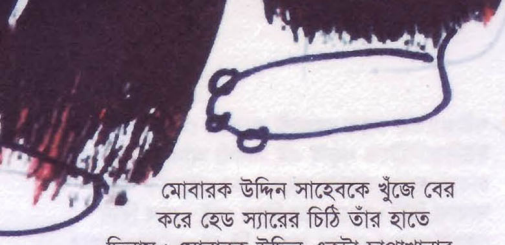

মোবারক উদ্দিন সাহেবকে খুঁজে বের করে হেড স্যারের চিঠি তাঁর হাতে দিলাম। মোবারক উদ্দিন একটা ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানার নাম মিশন প্রেস। তাঁর প্রকাশনা সংস্থা আছে। সেখান থেকে ধর্মের বই এবং সেক্সের বই বের হয়। সেক্সের বইগুলো গোপনে বিক্রি হয়। সবচে' বেশি বিক্রি হয় যে বই তার নাম 'ভাবি-দেবরের কামলীলা'। বইয়ের ভেতরে অনেকগুলো খারাপ খারাপ ছবি আছে। স্যার, আপনি দেখেছেন কি-না জানি না। মনে হয় দেখেন নাই। এইসব বই ভদ্রসমাজের জন্য না।

মোবারক উদ্দিন মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু হাতির মতো শরীর। সারাক্ষণ ঘামেন। তাঁর গরম বেশি বলে গায়ে কাপড় রাখতে পারেন না। খালি গায়ে থাকেন। একটা গামছা জড়ানো থাকে। এই গামছায় একটু পর পর মুখ মোছেন। মোবারক উদ্দিন বললেন, তোমার নাম দৌলত শাহ?

আমি বললাম, জি স্যার।

তিনি বললেন, আমাকে স্যার বলবা না। আমি মাস্টারও না, অফিসারও না। আমাকে বস ডাকবা।

জি আচ্ছা।

হেড মাস্টার সাব চিঠি দিয়ে আমাকে ফেলেছেন বিপদে। আমার বাড়িটা হোটেল না, এতিমখানাও না। বুঝেছ?

জি স্যার।

আবার স্যার। মারব থাপ্পড়। বলো 'জি বস'।

জি বস।

তারপরেও হেড স্যারের চিঠির অমর্যাদা আমি করি না। আমি যার নুন খাই তার গুণ গাই। কিছুদিন হেড স্যারের নুন খেয়েছি। তুমি এক কাজ করো, এক সপ্তাহ পরে আস, দেখি থাকার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি-না।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, এই এক সপ্তাহ কই থাকব?

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, এই এক সপ্তাহ কই থাকবা সেটা তুমি জানো। আমার কথা শেষ, এখন বিদায় হও।

ঢাকা শহরে আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। হোটেলে থাকার মতো পয়সাও নাই। কী করব বুঝতে পারলাম না। প্রেসের সামনে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। সেই বেঞ্চিতে বসে রইলাম। দুপুরে কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট থেকে দু'টা পরোটা আর বুটের ডাল কিনে খেলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার বেঞ্চিতে বসলাম। প্রেস রাত বারোটার সময় বন্ধ হলো। ভেবেছিলাম কেউ একজন বলবে রাতটা প্রেসের ভেতর কাটিয়ে দিতে। কেউ কিছু বলল না। তারা বেঞ্চ ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে চলে গেল। ঢাকা শহরে আমার প্রথম রাত কাটল মিশন প্রেসের সামনে হাঁটাহাঁটি করে। প্রেসের সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে বলে জায়গাটা আলো হয়ে আছে। হাতে কোনো বই থাকলে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বই পড়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারতাম। সঙ্গে কোনো বই ছিল না।

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে মোবারক উদ্দিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। অতি বিরক্ত গলায় বললেন, রাতে কোথায় ছিলা? শুনলাম প্রেসের সামনে হাঁটাহাঁটি করেছ।

আমি বললাম, জি বস।

প্রুফ রিডিং-এর কাজ জানো?

জি-না।

বানান জানলেই প্রুফ রিডিং-এর কাজ জানা হয়। বানান জানো?

আমি বললাম, জানি বস।

মোবারক উদ্দিন বললেন, মিজান কই? এদিকে আস, এই ছেলে বানান জানে কি-না দেখ।

মিজান কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেহারায় বিড়াল ভাব আছে। দেখে মনে হয় আল্লাহ তাঁকে বিড়াল বানাতে

হাওয়ার হাট.কম

গিয়ে শেষ মুহূর্তে মত পাল্টে লম্বা মানুষ বানিয়েছে। ভদ্রলোকের মুখভর্তি দাঁত। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। দেখেই মনে হয় তার দাঁত ধারালো। মিজান বললেন, 'কি' এবং 'কী' এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কী?

আমি বললাম, স্যার জানি না।

তিনি মনে হলো আমার উত্তর শুনে খুশি হলেন। তিনি আনন্দের হাসি হেসে বললেন, দুটাই প্রশ্নবোধক। যে 'কি'র উত্তর মাথা নেড়ে দেয়া যায় সেটা হ্রস্বই কারে 'কি'। যেমন ভাত খেয়েছ কি? আবার যার উত্তরে কিছু বলতে হয় মাথা নেড়ে কাজ হয় না সেটা দীর্ঘইকারে 'কী'। যেমন তোমার নাম কী? এই প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়লে হবে না। নাম বলতে হবে। কাজেই দীর্ঘইকার।

মোবারক উদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, মিজান! বাংলার প্রফেসরি বন্ধ করো। তুমি প্রফেসর না। ইন্টার ফেল পাবলিক। এই ছেলে পারবে কি পারবে না– সেটা বলো।

মিজান বললেন, ডিকশনারি দেখতে পারলে পারবে। শিখায়া পড়ায়া নিতে পারব। ডিকশনারি দেখতে না পারলে হবে না।

মোবারক উদ্দিন বললেন, ডিকশনারি দেখতে পারবে না এটা তুমি কী বললা বিলাইয়ের মতো। তোমার চেহারা যেমন বিলাইয়ের মতো, বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলাইয়ের মতো। এই ছেলে মেট্রিকে রাজশাহী বোর্ডে থার্ড হয়েছে। ইন্টারে হয়েছে সাত নম্বর।

স্যার! গল্পের মধ্যে একটু মিথ্যা বলে ফেলেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। মোবারক উদ্দিন আমার এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে কিছু বলেন নাই। এটা আমি বানায়ে বলেছি।

আমি যে পড়াশোনায় ভালো এটা যেন আপনি জানেন সেই কারণে বলেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। মোবারক উদ্দিন যেটা বললেন সেটা হলো– তোমার চেহারা যেমন বিলাইয়ের মতো কথাবার্তাও বিলাইয়ের মতো। পরীক্ষা নিয়া দেখ ডিকশনারি দেখতে পারে কি-না।

আমি ডিকশনারি দেখা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। ঠিক হলো সেকেন্ড প্রুফ দেখব। ফার্স্ট প্রুফ এবং লাস্ট প্রুফ দেখবেন মিজান। ফর্মা প্রতি পাব কুড়ি টাকা। এখান থেকে আমার খাবারের খরচ কেটে বাকিটা দিয়ে দেয়া হবে। অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত থাকব মিশন প্রেসে।

মিজান সাহেব আমার দেখা প্রথম লেখক। তিনি সব ধরনের বই লেখেন। তার লেখা 'ছোটদের ক্রিকেট' যেমন আছে তেমনি আছে 'ছোটদের বিশ্বকাপ ফুটবল'।

তিনি কয়েকটা সেক্সের বইও লিখেছেন। এই বইগুলো সবচে' চালু। নিউজ প্রিন্টে দশ হাজার এডিশন ছাপা হয়। এজেন্টের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তার গদ্য ভালো। বানান নির্ভুল। তার লেখা 'নষ্টা মেয়ের মধ্যরাতের নষ্টামী ও দুষ্টামী' বইটির প্রথম কয়েক লাইন পড়লেই আপনি বুঝবেন। বইটা আমার সঙ্গেই আছে। স্যার পড়ে শোনাই। কিছু যদি মনে না করেন।

তার নাম কমলা। গাত্রবর্ণ কমলার মতো। মুখমণ্ডল কমলার মতো গোলাকার। বক্ষদেশও কমলার মতোই সুডৌল এবং গোলাকার। তবে বক্ষদেশের বর্ণ কমলার মতো না। ঈষৎ গোলাপি। সে নিয়মিত স্তন যুগল গোলাপজলে ধৌত করে বলে সেখানে গোলাপের সুবাস পাওয়া যায়।

স্যার, আপনার কাছে অনেক ফাউল কথা বলে ফেলেছি। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। মিজান সাহেবের কথা বলি, ওনার বয়স চল্লিশ। তিনি চিরকুমার। অতি ভদ্র এবং বিনয়ী। প্রেসের সবাই তাকে ডাকে ম্যাও মামা।

তিনি রাগ করেন না। আমি তাকে মিজান মামা বলে ডাকা শুরু করেছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে ভাইয়া ডাকবে। মামা বা আংকেল ডাকার মতো বয়স আমার হয় নাই। আমার ক্রনিক আমাশা আছে। এই কারণে

AMARBOI.COM
বইয়ের হাট.কম

আমি জ্ঞানীর মতো কথা বলা শুরু করেছি? আমার মনে হয় হচ্ছে, কারণ আপনি ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। স্যার যদি অপরাধ না নেন তাহলে বলি। আমি কিন্তু ভালো পড়াশোনা করা ছেলে। আমাদের এলাকায় বিশাল বড় একটা পাঠাগার আছে। নাম 'অশ্বিনী বাবু সাধারণ পাঠাগার'। অশ্বিনী বাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই দিয়ে পাঠাগার। বাংলাদেশের যেকোনো বড় পাবলিক লাইব্রেরির চেয়েও সেই পাঠাগারের বইয়ের সংখ্যা বেশি। অশ্বিনী বাবু এক রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে যান। তাঁর বাড়িঘর নিয়ে নানান ক্যাঁচাল শুরু হয়। তাঁর বই দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরি করা হয়। বিএনপি আমলে সেই লাইব্রেরির নাম হয় 'শহীদ জিয়া পাবলিক লাইব্রেরি'। আওয়ামী লীগ আমলে নাম বদলে হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাঠাগার।' আমার কাছে সবসময় অশ্বিনী বাবু পাঠাগার। আমি এক বছর এই পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। আমার মাসিক বেতন ছিল একশ' ত্রিশ টাকা। এই টাকাটা আমাকে নিজের পকেট থেকে আমাকে দিতেন পৌরসভার চেয়ারম্যান জলিল সাহেব।

অশ্বিনী বাবুর পাঠাগারে কোনো গল্প উপন্যাসের বই ছিল না। একটু ভুল বললাম, চারটা গ্রন্থাবলি ছিল (রবীন্দ্র, মানিক, বিভূতি এবং তারাশঙ্কর)। বাকি সব বই এককথায় জ্ঞানের বই। ইতিহাস, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান। প্রথমে বইপড়া শুরু করেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে, শেষে নেশার মতো হয়ে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত বই না পড়ে ঘুমাতে পারতাম না। গোগ্রাসে ভাত খাওয়ার কথা জানি, তখন জানলাম গোগ্রাসে বইপড়া। আমার বইপড়া অভ্যাসটা একসময় খুব কাজে এলো।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে বলে বয়স বেশি মনে হয়।

আমার থাকার ব্যবস্থা হলো মিজান ভাইয়ার ঘরে। এই ঘরে ফ্যান আছে। তিনি ফ্যান ছাড়েন না, কারণ ফ্যানের বাতাসে তাঁর ঠাণ্ডা লাগে। বুকে কফ বসে যায়। ঘরে একটা জানালা আছে, সেই জানালা তিনি খুলেন না, কারণ জানালা দক্ষিণমুখী। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। এই হাওয়াতেও তাঁর সমস্যা। সারারাত তিন বিরামহীন কাশেন। এই কাশি দিনে থাকে না। রাতে ঘুমুতে যাবার পর থেকে তিনি কাশতে শুরু করেন। গল্পের প্রায় সবটাই বাংলা বানান বিষয়ে।

'বাংলা একাডেমী এক ধরনের বানান শুরু করেছে। নতুন বানানরীতি। এই রীতিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বানান ভুল। আফসোসের কথা কিনা তুমি বলো।'

উনি যা বলেন আমি তাতেই সায় দেই। আশ্রিত মানুষের সাধারণ প্রবণতা থেকে এই কাজটা করে। তাদের মাথায় থাকে সবাইকে খুশি রাখতে হবে।

স্যার, আপনার কি মনে হচ্ছে কীভাবে সেটা বলি।

স্যার, আপনি মূল গল্পে আসতে বলেছেন। এই কথাগুলো না বলে মূল গল্পে আসা যাবে না। একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। স্যার প্লিজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

হাটের হাট.কম

থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের একজন অধ্যাপক, ধরা যাক তাঁর নাম প্রফেসর মোহিত হাওলাদার (নকল নাম দিলাম, আসল নাম দিতে চাচ্ছি না।) তাঁর একটা বই ছাপা হচ্ছিল আমাদের মিশন প্রেসে। বইয়ের নাম– 'কোয়ান্টাম জগৎ'। বইয়ের ফাইনাল প্রুফ আমি স্যারের ফুলার রোডের বাসায় নিয়ে যাই। প্রুফ ভেতরে পাঠিয়ে আমি স্যারের বসার ঘরের সোফার এক কোণায় বসে থাকি। স্যার আগের প্রুফ ফেরত পাঠান। কোনো কোনো দিন সঙ্গে সঙ্গেই প্রুফ পাই। আবার কখনো দুই তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। একদিনের কথা– আমি অনেকক্ষণ বসে আছি। সকালবেলা গেছি, দুপুর হয়ে গেছে। স্যার আগের প্রুফ দিচ্ছেন না। আমি চলে যাব নাকি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তাও বলছেন না। অন্যদিন এত দেরি হলে চা বিস্কিট আসে, আজ তাও আসছে না। এক সময় স্যার বসার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, তুমি? তুমি কখন এসেছ?

সকাল আটটায় এসেছি স্যার।

স্যার বললেন, আশ্চর্য কথা। একটা ত্রিশ বাজে, আমাকে তো কেউ বলেনি তুমি এসেছ। সরি এক্সট্রিমলি সরি। তোমার নাম কী?

আমি নাম বললাম। স্যার আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, প্রুফ কে দেখে?

আমি বললাম, ফার্স্ট প্রুফ দেখেন আমাদের একজন প্রুফ রিডার। ওনার নাম মিজান। আমি সেকেন্ড প্রুফ দেখি।

তোমাদের প্রুফ রিডিং খুবই ভালো। প্রায় নির্ভুল। চা খাবে?

আমি বললাম, জি না স্যার।

দশটা মিনিট বসো, আমি প্রুফ এবং প্রিন্ট অর্ডার একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

স্যার দশ মিনিটের কথা বলে প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রুফ হাতে বসার ঘরে ঢুকে বললেন, এসো খেতে আস। এতবেলা না খেয়ে যাবে কেন? অস্বস্তিবোধ করার কোনো কারণ নেই। বাথরুম ঐদিকে। হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসো। আমিও তোমার সঙ্গে খাব। আমি একা থাকি, তুমি জানো তো?

জানি স্যার।

ব্যাচেলর বাড়ির খাওয়া ভালো কিছু থাকবে না। One item food. এটাই আমার পছন্দ। আমার ফিলোসফি– আমরা খাই বেঁচে থাকার জন্যে। সুখাদ্য খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকি না।

খাওয়ার টেবিলে দু'জন বসলাম। সত্যি সত্যি এক আইটেম খাওয়ার। খিচুড়ি জাতীয় বস্তু। প্রচুর সবজি দেয়া। মাংসও আছে।

স্যার বললেন, ক্যালোরি হিসাব করে রান্না। পুরো এক প্লেট খিচুড়িতে ক্যালোরি হবে দু'হাজার। চামচ দিয়ে যদি খাও তাহলে প্রতি চামচে সত্তর থেকে আশি ক্যালোরি।

খাওয়ার এক পর্যায়ে হঠাৎ আমি স্যারকে একটা প্রশ্ন করে বসলাম। তিনি তাঁর বই এ লিখেছেন 'ইলেকট্রন ঘুরছে আমরা বলে থাকি। ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের অবস্থানটা কী? অবস্থান অজানা। অবস্থান তখনি জানা যাবে যখন একজন অবজারভার বা একজন পরিদর্শক ইলেকট্রন কোথায় আছে জানার চেষ্টা করবেন। তার আগে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ পরিদর্শক বা অবজারভার নির্ভর জগৎ।'

আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে স্যারকে বললাম, স্যার আপনি বইয়ে এ লিখেছেন 'কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎ অবজারভার নির্ভর। যেহেতু আমরা প্রতিটি ইলেকট্রন অবজারভ করছি না সেহেতু এই জগৎ অস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণই ধোঁয়াটে।'

স্যার সামান্য বিস্মিত হয়ে বললেন, তা অবশ্যি বলেছি। তাঁর বিস্ময়ের কারণটা স্পষ্ট। তিনি আশা করেননি একজন প্রুফ রিডার তার লেখা বইয়ের অংশ মুখস্থ বলবে।

আমি বললাম, স্যার একজন Observer তো আছে যে Observer প্রতিটি ইলেকট্রন প্রোটন দেখছে। কাজেই সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগৎও নির্দিষ্ট। অস্পষ্ট না।

স্যার বললেন, সেই অবজারভারটা কে?

আমি বললাম, স্যার আল্লাহপাক।

তোমার পড়াশোনা কী?

আমি বললাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব বলে এসেছি। কেমিস্ট্রি পড়ার ইচ্ছা।

রেজাল্ট কী?

আমি রেজাল্ট

AMARBOI.COM

বইয়ের হাট.কম

বললাম।

স্যার বললেন, কেমিস্ট্রি ছাতামাতা পড়ে লাভ নেই। মূল বিজ্ঞান হলো পদার্থবিদ্যা। সৃষ্টির রহস্য জানতে হলে পদার্থবিদ্যা পড়তে হবে। তুমি পড়বে ফিজিক্স।

আমি তখন সামান্য সাহস পেয়েছি। আমি বললাম, সৃষ্টির রহস্য তো স্যার কোনোদিনই জানা যাবে না।

কেন জানা যাবে না?

আমি বললাম, স্যার আমরা তো সৃষ্টির একটা অংশ। সৃষ্টির অংশ হয়ে সৃষ্টিকে কীভাবে জানব? সৃষ্টিকে জানতে হলে তার বাইরে যেতে হবে। সেটা কি স্যার সম্ভব?

না সম্ভব না।

আমি বললাম Big Bang থেকে সৃষ্টি শুরু। সৃষ্টিকে জানতে হলে আমাদের Big Bang-এর আগে যেতে হবে। স্যার, এটা কি সম্ভব?

স্যার বললেন, বিজ্ঞান নিয়ে তুমি কি পড়াশোনা করো?

হাতের কাছে বইপত্র যা পেয়েছি পড়েছি। সবই Popular Science.

যেসব বই পড়েছ তার একটার নাম বলো।

আমি বললাম, The hole in the Universe. অথরের নাম K.C. Cole.

আমার কাছে প্রচুর বই আছে। Popular Science না, Real Science. তুমি যেকোনো বই আমার লাইব্রেরি থেকে নিতে পারো। খাতায় নাম লিখে বই নেবে। যখন ফেরত দেবে নাম কেটে দেবে।

জি স্যার।

আজ থেকেই শুরু হোক। নিয়ে যাও কিছু বই।

স্যারের বাসা থেকে চারটা বই নিয়ে এলাম। এর মধ্যে একটা উপন্যাস। উপন্যাসের নাম The curious incident of the dog in the night time. বইটার লেখকের নাম Mark Haddon.

স্যার, এখন আমি মূল গল্পে ঢুকব।

আমার বস মোবারক উদ্দিন সাহেব আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। থাকার ব্যবস্থা হলো তাঁর গুদাম ঘরে। পুরনো ঢাকায় যেমন বহুদিনের পুরনো দালানকোঠা থাকে সেরকমই একটা দালান। মিউনিসিপ্যালিটি পাঁচ বছর আগে বিল্ডিংটাকে Condemed ঘোষণা করে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। আমার বস টাকা খাইয়ে সেটা বন্ধ রেখেছেন। বাড়িটার নাম 'আশা কুটির'। বাড়ির শ্বেতপাথরের মেঝে থেকে বোঝা যায়

বইয়ের হাট.কম

একসময় এর অনেক শান-শওকত ছিল। তখন পুরোদস্তুর জঙ্গলখানা। একতলায় প্রেসের ম্যাটার, পুরনো বইয়ের গাদা। একটা ভাঙা ট্রেডল মেশিন। সিসার টাইপ। দুই সেট উইয়ে খাওয়া সোফা। দোতলার চারটা ঘরের দু'টার দরজা-জানালা কিছুই নেই। একটা অংশের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দুটো অক্ষত ঘরের পুরোটা পুরনো আমলের ফার্নিচারে ঠাসা। বড় একটা আলমারি আছে। সেই আলমারি তালাবদ্ধ। তালায় জং পড়েছে। গত দশ বছরে এই আলমারি কেউ খুলেনি তা বোঝা যাচ্ছে। আমাকে ঘর দু'টার যেকোনো একটায় থাকতে বলা হলো। আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে যে কাজটা করা হলো তা-না। পাহারাদারের কাজ পেলাম। একজন দারোয়ান সারা রাত বাইরে ডিউটি দেবে। আমি থাকব ভেতরে। ডাবল সুরক্ষা।

ফার্নিচার সরিয়ে একটা ঘরের কোণায় চৌকি পাতলাম। ঘরটায় জানালা নেই। তিনটা জানালাই পেরেক মেরে পুরোপুরি বন্ধ। দরজা খোলা রাখলে সামান্য আলো আসে। দরজা বন্ধ করলেই কবরের অন্ধকার।

দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ করলাম। একটা জানালা খোলা যায় কি-না।

দারোয়ান বলল, কেন যাবে না! বসকে বলে মিস্ত্রি ডাকিয়ে খুলে দিলেই হয়।

বস কি রাজি হবেন?

অবশ্যই রাজি হবেন। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকতে হবে। দোতলায় ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গেছে। তার ঠিক করতে হবে। একটা ফ্যান লাগবে। ফ্যান ছাড়া থাকতে পারবেন না।

আমি বললাম, ফ্যান পাব কই?

দারোয়ান বলল, ফ্যানের অসুবিধা নাই। একতলার মালখানায় কয়েকটা ফ্যান আছে।

দারোয়ানের নাম ছামছু। আমি তাকে ডাকি সামসু, বয়স চল্লিশের মতো। তার তিনটা রিকশা আছে, ভাড়ায় খাটে। রাত বারোটায় রিকশাওয়ালা রিকশা জমা দিয়ে যায়। তখন সামসু গুদামঘর পাহারা বাদ দিয়ে নিজেই রিকশা নিয়ে বের হয়। রাত বারোটার পর রিকশা ভাড়া হয় দু'গুণ তিনগুণ। অল্প পরিশ্রমে ভালো পয়সা।

সামসু বলল, আপনি বসকে আমার রিকশা নিয়ে ট্রিপে যাওয়ার কথা বলবেন না। আমিও আপনার বিষয়ে কিছু বলব না।

আমি বললাম, আমার কী বিষয়?

সামসু নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আপনি যুবক ছেলে। যুবক ছেলের কত বিষয়ই থাকতে পারে। ধরেন ঘরে মেয়ে মানুষ নিয়া আসলেন।

প্রথমবারের মতো রাতে গুদামঘরে থাকতে গেলাম। মিস্ত্রি ডাকা হয়নি। ইলেকট্রিসিটির

AMARBOI.COM

কানেকশন নাই। হারিকেন জ্বালিয়েছি। দরজা বন্ধ করতেই ভাদ্রমাসের তালপাকা গরমে তুঙ্গে গেলাম। বড় ভুল যেটা করেছি তালপাতার হাতপাখা কেনা হয়নি। খাবার পানির ব্যবস্থা করেছি। এক জগ পানি রেখেছি টেবিলের ওপর। টেবিলটা সাধারণ না। ময়ূর আঁকা আধা পুরনো আমলের গাবদা ড্রেসিং টেবিল। বড় আয়না আছে। আয়নার মাঝামাঝি বড় ধরনের ভাঙা। হারিকেনটাও ঐ টেবিলে রাখা। হারিকেনের আলোয় বই পড়ে রাত কাটানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। মূল দরজাটা খোলা রাখলে কিছু আলো আসত। কিন্তু বস বলে দিয়েছেন– ডাবল সিটকিনি দিয়ে দরজা লাগাতে। ঘরে অনেক দামি দামি পুরনো আমলের জিনিস আছে।

আমি বই পড়তে শুরু করেছি। The curious incident নামের বইটা পড়তে শুরু করেছি। অদ্ভুত বই। ফার্স্ট চ্যাপ্টার নেই, শুরু হয়েছে সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে। প্রথম লাইন–

It was seven minutes after midnight.

আমি নিজের ঘড়ি দেখলাম। কী আশ্চর্য, আমার ঘড়িতেও বারোটা সাত। কাকতালীয় ব্যাপার তো বটেই। মাঝে মাঝে কাকতালীয় ব্যাপারগুলো এমন হয় যে বুকে ধাক্কার মতো লাগে।

অল্প সময়ের ভেতরেই বইয়ের ভেতরে ঢুকে গেলাম। পানির তৃষ্ণা পেয়েছে অথচ পানি খাবার জন্য বই পড়া বন্ধ রেখে যে টেবিলের কাছে যাব সেই ইচ্ছাও হচ্ছে না। গরমে আমার গা দিয়ে ঘাম পড়ছে। ঘামে বিছানার চাদর ভিজে গেছে– আমার লক্ষই নেই। প্রবল তৃষ্ণার কারণে আমি এক সময় বই বন্ধ করে টেবিলের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে অল্পবয়সী এক মেয়ে। সে গভীর আগ্রহে নিজেকে দেখছে। আমি এরকম সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে কখনো দেখিনি। মেয়েটার গায়ে ঘাগরা জাতীয় পোশাক। পোশাকের রঙ হালকা কমলা। সেখানে ছোট ছোট আয়না বসানো। হারিকেনের আলো সেই আলোয় পড়ে চারদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঘরময় ছোট ছোট আলোর বিন্দু। মেয়েটির চুল বেণি করা। বেণিতে কমলা রঙের ফিতা। তার মুখ লম্বাটে। নাক খানিকটা চাপা। নাকে নাকফুল আছে। সেই নাকফুলও হারিকেনের আলোয় ঝলমল করছে। নিশ্চয়ই দামি কোনো পাথরের নাকফুল। কমদামি পাথর এভাবে আলো ছড়ায় না।

আমি 'কে কে' বলে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলালাম। কারণ ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্ন দেখছি। চিৎকার চেঁচামেচি না করে স্বপ্নটা ভালোমতো দেখা যাক।

স্যার! আমি যা দেখছি তা যে সত্যিই দেখছি স্বপ্নও দেখছি না তা তখন বুঝিনি। স্বপ্ন সাদাকালো হয় এবং স্বপ্ন হয় গন্ধবিহীন। আমি সব রঙিন দেখছি এবং মেয়েটার গা থেকে আতর কিংবা সেন্টের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।

আয়নার উপর দিয়ে একসময় একটা টিকটিকি দৌড়ে গেল। মেয়েটা সামান্য চমকালো। এ ধরনের ডিটেলও স্বপ্নে থাকে না। স্বপ্নে যদি কেউ টিকটিকি দেখে তখন সেই টিকটিকি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আসে।

মেয়েটা আয়নায় নিজেকে দেখা শেষ করে ঘুরল। এখন সে অবশ্যি আমাকে দেখছে। তার চোখ ভাবলেশহীন। যেন সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমি বললাম, তুমি কে? ঘরে ঢুকলে কীভাবে?

আমি মেয়েটিকে ভয় পাচ্ছি না। কারণ আমি জানি– স্বপ্ন দেখছি। অতি রূপবতী একটা মেয়েকে স্বপ্নে দেখে কেউ ভয় পায় না। ভূত প্রেত, সাপ, বাঘ, সিংহ দেখতে ভয় পায়।

মেয়েটা কী কারণে যেন নড়ল। ঝনঝন শব্দ হলো। আমি দেখলাম তার হাতে একগোছা চাবি। সে আবার আয়নার দিকে তাকাল। হাসির মতো ভাব করে টেবিলের উপর রাখা ফিজিক্সের বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টাল। সে বইটা রেখে দিল। তবে ঠিক আগে যেখানে ছিল সেখানে রাখল না– একটু সরিয়ে রাখল এবং উল্টো করে রাখল। এখন সে এগিয়ে যাচ্ছে তালাবদ্ধ আলমারির দিকে। আমি তাকিয়ে আছি। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত সে চাবির গোছা দিয়ে আলমারির তালা খোলার চেষ্টা

বইয়ের হাট.কম

চালাতেই লাগল।

এক সময় মসজিদের আজান হলো। মেয়েটাকে আর দেখা গেল না।

সারারাত জেগেছিলাম। ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ভালো ঘুম হলো না। আজেবাজে সব স্বপ্ন। বল্লম হাতে কিছু মানুষজন ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। তাদের হাতে তীর ধনু। আমি প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। বাচ্চাগুলো বিচ্ছু প্রকৃতির। এদের গতি বাতাসের মতো। আমাকে প্রায় ধরে ফেলে এমন অবস্থা। এরা তীর ছুড়ছে। কিছু কিছু গায়ে লাগছে। যেখানে লাগছে সেখানে চিড়বিড় জ্বলুনি। এদের একটা তীর ঘাড়ে লাগল। প্রচণ্ড জ্বলুনিতে ঘুম ভাঙল। জেগে দেখি, বিছানা ভর্তি বড় বড় লাল পিঁপড়া। এরাই আমাকে কামড়াচ্ছিল। আমার মস্তিষ্ক সেই কামড়ানোকে বাচ্চাদের ছোড়া তীর হিসেবে আমাকে দেখিয়েছে।

মানুষের ব্রেইন খুব অদ্ভুত। সে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা নিজের মতো করে। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হলো, আমার ক্ষেত্রেও কি এরকম কিছু ঘটেছে? আমার ব্রেইন একটি তরুণী মেয়ে তৈরি করে আমাকে দেখাচ্ছে।

সারাদিন ঘর থেকে বের হলাম না। সামসুকে দিয়ে পরোটা-ভাজি এনে খেলাম। ইংরেজি উপন্যাসটা পড়ে শেষ করলাম। দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে জেগে উঠলাম সন্ধ্যাবেলা। সামসুও জেগে উঠাল। চিন্তিত মুখে বলল, সারাদিন ঘুমাইছেন। ঘর থাইকা বাইর হন নাই– শরীর খারাপ?

আমি বললাম, শরীর খারাপ না। রাতে ঘুম হয় নাই এটাই সমস্যা।

সামসু বলল, যে গরম ঘুমাইবেন ক্যামনে? তয় সমস্যা নাই, ইলেকট্রিশিয়ান আনছি। লাইন ঠিক করতেছে। লাইন ঠিক কইরা ফ্যান লাগায়ে দিবে। এক ঘণ্টার মামলা।

আমি ইতস্তত করে বললাম, সামসু এই বাড়িতে ভূত-প্রেত আছে না-কি?

সামসু বলল, ঢাকা শহরেই কোনো ভূত নাই। মানুষ থাকার জায়গা নাই ভূত থাকব ক্যামনে? তবে গ্রামগঞ্জে দুই-একটা থাকলে থাকতেও পারে।

AMARBOI.COM

বইয়ের হাট.কম

মিশন প্রেসে একবার যাওয়া দরকার ছিল। সেখানে সারাদিন যা কম্পোজ হয়– সন্ধ্যার পর তার প্রুফ দেখা হয়। মিশন প্রেসে যেতে ইচ্ছা করল না। হোটেলে রাতের খাওয়া সারলাম। সস্তার তেহারি এক প্লেট দই। দইটা খেলাম শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য। শরীর কোনো কারণে গরম হলে মানুষ আজেবাজে স্বপ্ন দেখে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ফিরে আমি অবাক। একশ' পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ঘরে দিনের মতো আলো। বিছানার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। ঘরে বাতাসের বন্যা। সামসু বলল, কাইল রাইতে ঘুমাইতে পারেন নাই, আইজ নাক ডাকায়া ঘুমাইবেন।

আমি বললাম, ফ্যান থেকে তো জাহাজের মেশিন ঘরের মতো শব্দ আসছে।

সামসু বলল, আসুক। শব্দ কোনো বিষয় না। গরমটা বিষয়।

আমি বিছানায় শুয়ে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। Hole in the Universe. নামটা যত সুন্দর বই তত সুন্দর না। লেখক কারণ ছাড়াই রহস্য করছেন। কথায় কথায় বাইবেল টেনে আনছেন। জটিল বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে যে বস্তু তৈরি হচ্ছে তার নাম জগাখিচুড়ি।

ভালো কথা স্যার, জগাখিচুড়ি শব্দটা কোত্থেকে এসেছে জানেন? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের দেয়া চাল-ডাল মিশিয়ে এক ধরনের খিচুড়ি তৈরি হতো। তার নাম জগন্নাথের খিচুড়ি। সেখান থেকে এসেছে জগাখিচুড়ি।

যে গল্পটা আপনাকে বলছি তার সঙ্গে জগাখিচুড়ি নামের ব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু বললাম যাতে আপনার বিশ্বাস হয় আমি পড়াশোনা করা ছেলে। গ্রামের কলেজ থেকে আসা হাবাগোবা ভালো ছাত্র না।

মূল গল্পে ফিরে যাই– আমি বই পড়ছি কিন্তু বইয়ে মন দিতে পারছি না। গত রাতে দেখা মেয়েটা কি আজো আসবে। তার গায়ে কি ঐদিনের পোশাক থাকবে? গত রাতে সে যা করেছে আজো কি তাই করবে। আলমারির তালা খোলার চেষ্টা করবে? বেশির ভাগ ভূতের গল্পে দেখা যায় ভূত-প্রেত রাতের পর রাত একই কাণ্ড করে। যে ভূতকে দেখা যায় সিলিং ফ্যান থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, তাকে সেই অবস্থাতেই সবসময় দেখা যায়।

রাত বারোটা পর্যন্ত বই পড়লাম, মেয়েটা এলো না। ঘরে একশ' ওয়াটের বাতি জ্বলছে, এই কারণে কি আসতে পারছে না? আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঘরে টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। মেয়েটার দেখা নেই। তখন মনে হলো, ঘরটা কবরের মতো অন্ধকার। এই অন্ধকারে মেয়েটাকে দেখব কীভাবে? হারিকেন জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রেখে অপেক্ষা শুরু করলাম।

অপেক্ষার নিজস্ব ক্লান্তি আছে। সেই ক্লান্তিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল গুনগুন শব্দে। কে যেন গান করছে। চমকে তাকিয়ে দেখি মেয়েটা এসেছে। তাকিয়ে আছে

বইয়ের হাট.কম

আয়নার দিকে। গুনগুন শব্দে এবং নিজের সুরেই সামান্য দুলছে।

স্যার, এখন একটা কথা বলব বেয়াদবি নিবেন না। আমি বয়সে আপনার ছেলের চেয়েও ছোট হব। বাপের বয়সী একজন মানুষের সঙ্গে এ ধরনের কথা বলা যায় না। কিন্তু আমি ঠিক করেছি কিছুই গোপন করব না। যা দেখেছি সবই আপনাকে বলব।

মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। কী সুন্দর যে তাকে দেখাচ্ছিল! লজ্জায় তাকাতে পারছিলাম না আবার চোখও ফিরিয়ে নিতে

পারছিলাম না। তার গায়ের পোশাকটা টেবিলের উপর রাখা। সে একসময় পোশাকটা পরল। গত রাতে ওড়না ছিল না। আজ দেখি ওড়না আছে। লাল রঙের ওড়না। ওড়নাটা সে মাথায় দিয়েছে। লাল ওড়নার ভেতর একটা মুখ। বড় বড় চোখ। গোলাপি ঠোঁট। আমি বললাম, এই মেয়ে তুমি কে? তোমার নাম কী?

মেয়েটার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে চাবির গোছা হাতে এগিয়ে গেল আলমারির দিকে। গত রাতের মতো তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। আমি বিছানা থেকে নামলাম। হারিকেনটা হাতে নিলাম। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে কিছুই বুঝল না। আমি বললাম, আলমারিতে কী আছে? তুমি কী খোঁজ? মেয়েটা নির্বিকার। তার ভুবনে আমার কোনো অস্তিত্ব নাই। হারিকেনের তেল শেষ হয়ে গিয়েছিল। দপ করে নিভে গেল। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি বিছানায় বসে রইলাম।

এত বড় একটা ঘটনা– কাউকে তো বলতে হবে। মিজান ভাইকে বললাম। তিনি আগ্রহ নিয়ে শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন।

মিজান ভাই বললেন, জুয়ান বয়সে সুন্দরী নেংটা মেয়ে দেখা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বয়সে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সেক্স হচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখে। তখন স্বপ্নদোষ হয়। আমার একটা বই আছে, নাম-- 'স্বপ্নের কাম কাহিনী'। বইটাতে স্বপ্নের সেক্স বিস্তারিতভাবে লিখেছি। পড়লেই সব বুঝবে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

মিজান ভাই বললেন, শরীর খুব বেশি চড়ে গেলে আমাকে বলবে আমি ব্যবস্থা নিব।

কী ব্যবস্থা নিবেন?

শরীর ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করব। তোমাকে প্রেস কোয়ার্টারে নিয়ে যাব। পনের দিনে একবার গেলেই শরীর দিঘির পানির মতো ঠাণ্ডা থাকবে। ভালো কিছু অল্পবয়েসী মেয়ে আছে আমার পরিচিত। ওদের বলে দেব। টাকা-পয়সা যাতে নামমাত্র লাগে সেটা আমি দেখব। তোমাকে অত্যধিক স্নেহ করি বলেই এটা করব।

আমাকে 'অত্যধিক স্নেহ' করা শুরু করলেন প্রফেসর মোহিত হাওলাদার। তার স্নেহ পাওয়ার কারণ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়েছি। যেকোনো সাবজেক্ট পড়তে পারি। আমি নিয়েছি ফিজিক্স।

মোহিত স্যার আমাকে বলেছেন, প্রথম এক বছর তুমি হোস্টেলে

AMARBOI.COM

বইয়ের হাট.কম

সিট পাবে না। এক কাজ করো, আমার বাড়িতে এসে ওঠ। গেস্ট রুমটা নিজের মতো গুছিয়ে নাও। খাবে আমার এখানে, আমি যা খাই তাই খাবে।

স্যারের গেস্ট রুমটা চমৎকার। সেখানে শুধু ফ্যান না, এসি পর্যন্ত আছে। আমি স্যারের সঙ্গে থাকতে এলাম না। কারণটা খুব পরিষ্কার। আমার পক্ষে গুদামঘর ছেড়ে আসা মানে মেয়েটাকে ছেড়ে আসা। সেটা সম্ভব না। আমি মেয়েটার একটা নাম দিয়েছি– 'আয়না'। সে আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখে বলেই তার নাম আয়না। যতক্ষণ আয়না থাকে ততক্ষণই আমি নিজের মনে বকবক করি। আয়না আমার কথা শুনতে পায় না। তাতে কী আছে?

আয়নাকে দেখামাত্র আমি বলি– 'আয়না কী খবর? আজ আসতে দেরি করছ কেন? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারছ? বৃষ্টিতে ভিজবে? চলো ভিজে আসি। তবে একটা কথা, তোমাকে নেংটো অবস্থায় আমি ছাদে নেব না। কাপড়টা গায়ে দাও তারপর নিয়ে যাব। আলমারি খোলার জন্যে এত চেষ্টা করতে হবে না। আমি একটা চাবিওয়ালা এনে আলমারি খোলার ব্যবস্থা করব। পরেরবার যখন আসবে দেখবে আলমারি খোলা। ঠিক আছে? খুশি?'

তালা খোলার লোক আমি ঠিকই নিয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো তালা খুলে মেয়েটা যদি আর না আসে? সে এখানে আসে তো শুধু তালা খোলার আগ্রহে। তালাওয়াকে ফেরত পাঠালাম।

স্যার, আমি মেয়েটার সঙ্গে অনেক রহস্যও করি। একদিন কী করলাম শুনুন। আয়নাটা কালো কাগজ দিয়ে স্কচটেপ মেরে ঢেকে দিলাম। সেদিন বেচারি খুবই অবাক হলো। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। যেন কিছু বুঝতে পারছে না। তখন আমি নিজেই উঠে টেনে কালো কাগজটা খুললাম। বেচারি শান্ত হলো।

আরেকদিন কী করেছি শুনুন। তার জন্যে একটা শাড়ি কিনে এনে টেবিলে রেখে দিয়েছি। সে অবাক হয়ে শাড়িটা হাতে নিয়ে দেখেছে। এদিক-ওদিক দেখেছে। ভাবটা এরকম যে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

একবার এক সেন্টের একটি শিশি রাখলাম। সে গন্ধ শুঁকল, এদিক-ওদিক তাকাল। তার মধ্যে হতভম্ব ভাব লক্ষ করলাম।

সারারাত আমি জেগে থাকি– ঘুমাতে যাই ভোরবেলায়। ঘুমের মধ্যে মেয়েটাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে তার সঙ্গে অনেক কথা হয়। স্বপ্নে তার গলার স্বর থাকে কিশোরী মেয়েদের মতো। স্বপ্নে সে আমাকে গান শোনায়, নাচ দেখায়।

আমার শরীর দ্রুত খারাপ করতে লাগল, একদিন বস আমাকে ডেকে পাঠালেন। ধমক দিয়ে বললেন, কী ঘটনা? কী অসুখ?

আমি বললাম, স্যার ঘুম হয় না।

ঘুম হয় না এটা আবার কেমন অসুখ? ডাক্তারের কাছে যাও। ঘুমের ট্যাবলেট দিবে।

আমি বললাম, জি আচ্ছা বস।

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছ খবর পেয়েছি, ক্লাসে তো যাও না।

ক্লাস শুরু হয় নাই।

টাকা-পয়সা লাগবে। লাগলে প্রেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে নাও। পরে শোধ দিও।

আমি প্রেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা নিলাম, সেই টাকায় আয়নার জন্যে রুপার একজোড়া কানের দুল কিনলাম।

অবাক কাণ্ড কী জানেন স্যার? রুপার কানের দুল কিছুক্ষণের জন্যে আয়না পরেছিল। এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আমার চোখে পানি এসেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে। শরীরে বিকার দেখা দিয়েছে। মিজান ভাইয়ের পরামর্শ মতো বিকার কাটাতে আজেবাজে মেয়েদের কাছে যেতে শুরু করেছি। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু

বইয়ের হাট.কম

হয়েছে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি না। কীভাবে যাব? সারারাত জেগে থাকি, সারাদিন ঘুমাই। শরীরের বিকার কাটাতে প্রতি সপ্তাহে একবার মিজান ভাইয়ের সঙ্গে 'প্রেস কোয়ার্টারে' যাই। আমার মোটেও খারাপ লাগে না। যে মেয়েটার কাছে আমি যাই, তার নাম নাসিমা। মেয়েটার বয়স অল্প। চোখে মায়া আছে। আমি আয়নার জন্যে যেসব জিনিস কিনি, আয়নাকে দেখানোর পর সব নাসিমাকে দেই। উপহার পেলে সে খুব খুশি হয়।

একদিন মোহিত স্যার আমার খোঁজে চলে এলেন। তিনি আমাকে দেখে হতভম্ব। তোমার একী অবস্থা! কী অসুখ বলো তো।

আমি মিথ্যা করে বললাম, স্যার আমার জন্ডিস হয়েছে। খারাপ ধরনের জন্ডিস।

স্যার বললেন, সে তো বুঝতেই পারছি– চোখ হলুদ, হাত-পা হলুদ। তোমাকে ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। দাঁড়াও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করি।

আমি বললাম, ব্যবস্থা করতে হবে না স্যার। আমার বাবা কাল ভোরে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

স্যার বললেন, তুমি তো আমাকে বলেছিলে বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলেছিলাম স্যার। বাবা বেঁচে আছেন। তিনি অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করেছেন বলে আমি সবাইকে বলি বাবা মারা গেছেন।

স্যার বললেন, বাবার সঙ্গে চলে গেলে তো চিকিৎসা হবে না। তোমার দরকার প্রপার মেডিকেল কেয়ার।

আমি বললাম, (পুরোটাই মিথ্যা) আমার বাবা একজন ডাক্তার। এমবিবিএস ডাক্তার। খুব ভালো ডাক্তার।

মোহিত স্যার চলে গেলেন।

AMARBOI.COM

বইয়ের হাট.কম

তার লেখা 'কোয়ান্টাম জগৎ' বইটা প্রকাশিত হয়েছে। তার একটা কপি আমাকে দিলেন। বইয়ে লিখলেন–

'দৌলত শাহ্‌কে

আমার দেখা সবচে' মেধাবী একজন।'

বইটার সঙ্গে এক হাজার টাকাও দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকায় আয়নার জন্য রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি কিনলাম। আমার ধারণা কোনো একদিন আমার দেয়া শাড়ি সে পরবে। আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করবে।

মোহিত স্যার তার বইয়ে প্যারালাল জগতের কথা লিখেছেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে, আমাদের এই জগতের পাশাপাশি ইনফিনিটি প্যারালাল জগৎ আছে। সব জগৎ একসঙ্গে প্রবহমান। একটি জগতের সঙ্গে অন্য জগতের কোনোই যোগাযোগ নেই।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আয়না অন্য কোয়ান্টাম জগতের বাসিন্দা। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার জগতের খানিকটা ঢুকে গেছে এই পৃথিবীর জগতে। কিংবা আরো জটিল কিছু। যে জটিলতা ব্যাখ্যা করার সাধ্য এই মুহূর্তে আমাদের নেই। আমাদের কাজ শুধু দেখে যাওয়া। একদিন রহস্যভেদ হবে, তার জন্য অপেক্ষা করা।

স্যার, আপনি লেখক মানুষ। সত্যিকার লেখক হলেন, একজন আদর্শ Ovserver. যিনি দেখেন, কোনো ঘটনা অবিশ্বাস করেন না, আবার বিশ্বাসও করেন না। তিনি অনুসন্ধান করেন absolute truth. স্যার আমি এখন যাব। আয়নার জন্য একজোড়া রুপার নূপুর কিনেছি। হাতে নিয়ে একটু দেখবেন।

সে নূপুর পায়ে দিয়ে হাঁটবে। ঝুমঝুম হাঁটবে। ভাবতেও ভালো লাগছে। আয়না যদি নূপুর পায়ে নাও দেয়, নাফিসা দেবে। সেটাও তো খারাপ না।

স্যার আমি নাফিসার নামও দিয়েছি আয়না। ভালো করেছি না? একজন রিয়েল সংখ্যা– অন্যজন ইমাজিনারি সংখ্যা। নাফিসা × হলে আয়না $\sqrt{-1}$ x। ■

বইয়ের হাট.কম

আমারবই.কম